‘ মানুষের মুক্তির সুবিশাল নিশান, মানুষ আর মানুষের মধ্যে শান্তির সুবিশাল নিশান অবশেষে উড়ছে।’

ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৭৫ বছর

শুভময়

৯ মে ১৯৪৫,পঁচাত্তর বছর আগের সেই বিজয় সকালে যোশেফ স্তালিনকে প্রথম দিকেই ফোন করেছিলেন কন্যা শেতলানা:

‘বাবা, অভিনন্দন! বিজয়।’

‘বিজয়, হ্যাঁ বিজয়। তুমি কেমন আছ?’ সংক্ষিপ্ত উত্তর স্তালিনের। ঠিক তার আগেই রেডিও মস্কোর সেই প্রবাদ হয়ে ওঠা ঘোষক আইজাক লেভিতান, ১৯৪১’র জুন মাসে আক্রান্ত হওয়ার দিন থেকে এই টানা প্রায় চার বছর যাঁর গাঢ় স্বরের দিকে সকালেই উৎকর্ণ হয়ে থাকত সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়া, ঘোষণা করেছেন — জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ শেষ।

তারপরেই ফোন করেছিলেন শেতলানা। স্তালিনের উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত। না, শুধু সংক্ষিপ্ত নয়, আশ্চর্য বিষণ্ণ।

খানিক পরে স্তালিনকে একইরকম ফোন করে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ক্রুশ্চেভের। একই ঠিক নয়, আরও কঠোর অভিজ্ঞতা। তিনি পেয়েছিলেন তিরস্কার।

অনেক পরে ক্রুশ্চেভ লিখেছিলেন, কেন তাঁকে এমন ফোন করতে গেলাম। আমি যেন সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই হিম হয়ে জমে যাচ্ছিলাম। আমি তো জানতামই তিনি তখন সামনের অনেক বড়ো কিছু ভাবছেন। বিগত চার বছরের অথবা এক যুগের পৃথিবীর জন্যে বিষণ্ণতা আর সামনের দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য উজ্জীবন—এই দ্বান্দ্বিকতায় ৯ মে’র সেই সকালে মগ্ন ছিলেন কমরেড যোশেফ স্তালিন।

ফ্যাসিস্ত নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিজয়।

এই বিজয়ের জন্যে বড়ো চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়াকে। সোভিয়েত হিসাব অনুযায়ী, প্রাণ দিতে হয়েছিল ২০ মিলিয়ন রুশবাসীকে, গৃহহীন হয়েছিলেন ২৫ মিলিয়ন মানুষ; ১,১৭০টি শহর এবং ৭০ হাজারেরও বেশি গ্রাম হয় সম্পূর্ণ অথবা অংশত ধ্বংস হয়েছিল। ৩১ হাজার কলকারখানা, ৪০ হাজার মাইল রেলপথ এবং ৪ হাজার রেল স্টেশন একেবারে নষ্ট হয়েছিল। সম্পত্তি ধ্বংসের পরিমাণ ছিল রুশ মুদ্রা অনুযায়ী ৬৭৯ বিলিয়ন রুবলের।

এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। শুধু নিজেদের জন্য নয়, শুধু সমাজতন্ত্রের জন্যেও নয়, সমগ্র দুনিয়ার নিরাপত্তার জন্যে।

শেতলানার ফোন পেয়ে স্তালিনের নিশ্চয় মনে পড়েছিল ছেলে ইয়াকভের কথা। তাঁরই মতো সন্তান, স্বামী, আত্মজন হারানো কোটি মানুষ - মানুষীর কথা। বিজয়ের পর প্রথম বেতার ভাষণেও তাঁর স্বর ছিল প্রশান্ত। সেখানে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার কথা — ‘সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এখন নিরাপদ।’

তারপরই ছিল দুনিয়ার মানুষের কথা — ‘মানুষের মুক্তির সুবিশাল নিশান, মানুষ আর মানুষের মধ্যে শান্তির সুবিশাল নিশান অবশেষে উড়ছে।’

নাৎসি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয় ছিল দুনিয়ার মানুষের জন্যেই।

২

১৯৪১ সালের ২২ জুন রাত শেষ হওয়ার আগেই সোভিয়েত রাশিয়াকে হতবাক করেই হানা দেয় নাৎসি জার্মানি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত জার্মানির যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর আগেই আসছিল নানা সূত্র থেকে। স্তালিন বিশ্বাস করেননি। পরে অনুতাপও ছিল তাঁর। একজন কমিউনিস্টের এমন সারল্য তো থাকেই। গোপন খবর দিয়েছিলেন খোদ মস্কোর জার্মান দূতাবাসের প্রধান কাউন্ট ভনদের শুলেনবার্গ। দু’সপ্তাহ আগে, তখন মস্কোয় থাকা বার্লিনের রুশ দূতাবাসের প্রধান দেফানোঝভকে এক ব্যক্তিগত ভোজসভায় ডেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন হিটলারের গোপন পরিকল্পনার কথা।

শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একদা লড়াই করা পোড় খাওয়া বলশেভিক দেফানোঝভও বিশ্বাস করতে চাননি সে কথা।

কমিউনিস্টদের এমন সারল্য তো থাকেই।

পরে অবশ্য শোধ নিয়েছিলেন হিটলার। আরও একটি অছিলা মিলিয়ে ১৯৪৪ সালের ১০ নভেম্বর কাউন্ট শুলেনবার্গকে ফাঁসি দেয় নাৎসিরা। সে অন্য কথা। আপাতত ১৯৪১’র ২২ জুন, অপারেশন বারবারোসা। ১৫১টি জার্মান ডিভিশন, ৩,৩৫০ টি ট্যাঙ্ক, ৭,২০০ টি নানা ধরনের কামান এবং ২,৭৭০ টি যুদ্ধ বিমান নিয়ে আগ্রাসী নৃশংসতায় দ্রুত সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে নাৎসি জার্মানি। জার্মান স্থলবাহিনী ভেরমাখ্ত, বিমান বাহিনী লুফ্তওয়েফ— সব মিলিয়ে হিটলারের লক্ষ্য চার সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধটাকে নিকেশ করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া।

শুরুর দিকে ঘটছিলও তেমনই গতিতে। ১,৭৫০ কিলোমিটার রুশ সীমান্ত জুড়ে ১৮০০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল নাৎসি বাহিনী। আহ্লাদে বার্লিন থেকে নজর রাখছিল থার্ড রাইখের সর্বোচ্চ যুদ্ধ নেতৃত্ব ওয়েরকোম্যান্ডো। অক্টোবরের মধ্যে জার্মান বাহিনী তার থাবার তলায় নিল রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ, দখলে নিল রাশিয়ার খাদ্যশস্যের ৩৮ শতাংশ, ইস্পাতের ৫৮ শতাংশ, অ্যালুমিনিয়ামের ৬০ শতাংশ, কয়লার ৬৩ শতাংশ এবং আকরিক লোহার ৬৮ শতাংশ। সামরিক উৎপাদনের ১,৮০০ কারখানাকে সরিয়ে নিতে হলো অন্যত্র।

দুনিয়ার দেশে দেশে শুধু সমাজতন্ত্রীরা নয়, মাটির পৃথিবীকে ভালোবাসা মানুষ তাকিয়ে আছেন রাশিয়ার দিকে, কী গভীর ত্যাগ আর তাগদ নিয়ে দানবের সঙ্গে লড়াইটা তারা লড়ে যাচ্ছে। জীবনের শেষ বছরে, শেষ দেড়-দু’মাস এই লড়াইয়ের দিকে কী উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন, সে কথা ইতিহাস জানে। গণশক্তি’র পাতাতেই লেখা হয়ে গেছে একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ যেদিন প্রয়াত হচ্ছেন, শ্রাবণের সেই বাইশে, আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাৎসি হানাদারেরা ঢুকে গেছে উক্রাইনের গভীর অবধি, তবু হিটলারকে নতুন করে বসতে হচ্ছে ওয়েরকোম্যান্ডোর সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে। পাঠাতে হচ্ছে মার্ক থ্রি ট্যাঙ্কের নতুন ৩৫০টি ইঞ্জিন। আর জার্মান ভেরমাখ্ত এর প্রধান কর্নেল জেনারেল ফ্রানৎজ হ্যালভার তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখছেন ১১ আগস্ট : ‘সমগ্র পরিস্থিতি আরও বেশি করে স্পষ্ট করছে, আমরা রাশিয়ার শক্তিকে ছোটো করে দেখেছিলাম’।

জাঁ পল সার্ত্র-র দিনলিপির কথা আমরা জানি।

লন্ডনে বসে তরুণ এরিক হবসবাম শুনছেন স্তালিনের বেতার ভাষণ। ভাইকে লিখছেন, ‘স্তালিনের ভাষণ, তার মানে সব অর্থেই জনযুদ্ধ— টেকনিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল।’ লাল ফৌজ নিয়ে এরিক বুক বাঁধছিল, ‘এক একদিন যখন তারা ঠেকিয়ে দিচ্ছে, এক একটি জয় যখন তারা অর্জন করছে, এক একটি যুদ্ধ

বিমান যখন তারা নামাচ্ছে, ইংরেজ আর সোভিয়েত মানুষ কাছাকাছি আসছে।'

দুনিয়ার মানুষ আর সোভিয়েত মানুষ কাছাকাছি আসছে। একটু পিছিয়ে, ২২ জুনের বার্লিনে যাই আমরা। সেই রাতেই মাঝরাতেই বার্লিনের রুশ দূতাবাসে টেলিফোন বেজে ওঠে : ' হের রাইখমিনিস্টার রিবেনট্রপ রুশ দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে চান। এখনই চলে আসুন। এখনই।'

দেখা করতে গিয়েছিলেন, দেফানোঝভ আর বেরঝকভ। একটু ছোটোখাটো চেহারার দেফানোঝভ দাঁড়িয়ে আছেন এস এস গার্ড পরিবৃত হয়ে রিবেনট্রপের সামনে। রিবেনট্রপ বললেন, 'ফুয়েরার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একশ শতাংশ সঠিক।'

ঘোষণাপত্রে কোথাও যুদ্ধ কথাটা লেখা ছিল না। লেখা ছিল বাংলা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'প্রতিরক্ষার উদ্যোগ' অথবা ' ডিফেন্সিভ মেসারস।'

হতবাক দেফানোঝভ টানটান উঠে দাঁড়ালেন। হাড়ে মজ্জায় বলশেভিক। রিবেনট্রপের চোখে চোখ রেখে বললেন, ' সোভিয়েত রাশিয়ার উপর এই অপমানকর, প্ররোচনামূলক এবং পূর্ণত ঘাতক যুদ্ধের জন্যে আপনাদের দুঃখ পেতে হবে। অনেক মূল্য দিতে হবে আপনাদের।'

ইতিহাসই সাক্ষী - সাবুদ।

৩

ইতিহাসই সাক্ষী- সাবুদ রাশিয়ার সাধারণ মানুষ আর লাল ফৌজের সাধারণ সেনাদের অম্লান আত্মত্যাগ আর দুর্জয় বীরত্বের।

নাৎসি হানাদার আর লাল ফৌজের যুদ্ধ যেমন দুনিয়ার কাছে জনযুদ্ধ, তেমনই ফ্যাসিস্তদের কাছে রাসেনক্যাম্ফ বা জাতিযুদ্ধ। তুমি শ্রেষ্ঠ জাতি, সুতরাং অন্য জাতিকে খুন করে তার সর্বস্ব দখল করার পুরো অধিকার আছে তোমার — সব দেশের সব কালের ফ্যাসিস্তদের মূল মন্ত্র। রাসেনক্যাম্ফ বা জাতিযুদ্ধের ধারণা পাখি পড়ানো হতো নাৎসিদের। পার হও সীমান্ত। রুশগুলো নিম্ন শ্রেণির মানুষ। এগিয়ে গেলেই বিজয়। সাধারণ লাল ফৌজিদের জার্মানরা বলতেন 'ইভান'। জার্মান সেনানায়করা ক্রমশ হতবাক হয়েছেন 'ইভান'দের বীরত্বে। অপারেশন বারবারোসার শুরুর দিন থেকেই 'ইভান'দের গড়া অগণন বীরগাঁথা। নাৎসি গোলন্দাজরা ঘিরে ধরেছে দুর্গ ব্রেস্ত লিতোভস্ক। এক মাস ধরে দুর্গ আগলে রেখে লড়ে যাচ্ছে গোনাগুনতি কয়েকজন লাল ফৌজি। খাবার, জল, গোলাবারুদ — কিছুই সরবরাহ নেই, তবু লড়াইয়ে লাল ফৌজি।

শেষ মুহূর্তে এক লাল ফৌজি দেওয়ালে আঁচড় কেটে লিখে যাচ্ছে : 'আমি মরে যাচ্ছি কিন্তু আত্মসমর্পণ করিনি। বিদায় মাতৃভূমি। ২০-০৭-৪১।'

ভাসিলি গ্রোসম্যানের সেই উপন্যাস, 'জীবন এবং নিয়তি।' বুড়ো বলশেভিক মোস্তভস্কি বলে ওঠে, 'তুমি কার জন্যে লড়ছ? লড়ছ ন্যায়ের পক্ষে, লড়ছ কমরেড লেনিনের নিশানের জন্য।'

সুতরাং আত্মসমর্পণ করো না। একজনকেও আত্মসমর্পণ করা চলবে না। যে আত্মসমর্পণ করে সে শুধু ভীরু নয়, বিশ্বাসঘাতক।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ যুদ্ধ পর্ষদ স্তাভকা প্রস্তুত করল আদেশনামা ২৭০। সেই আদেশনামা মেজে ঘষে আরও ধারালো করে নিলেন স্তালিন। দাঁড় করালেন সংগ্রামী কমিউনিস্ট নৈতিকতার নয়া মানদণ্ড। শত্রুর হাতে যে মরার আগে ধরা পড়ে, সে বিশ্বাসঘাতক।

স্তালিনের বড়ো ছেলে লেফটেন্যান্ট ইয়াকভ জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন ১৬ জুলাই ১৯৪১ ভিতেবস্কের কাছাকাছি। ইয়াকভকে নিয়ে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের সব প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেছিলেন স্তালিন।

আদেশনামা ২৭০।

ইয়াকভকে নিয়ে স্তালিনের সঙ্গে কথা বলার সাহস ছিল শুধু আর্মি জেনারেল গেওর্গি ঝুকভের। রাতের পর রাত একা পায়চারি করেছেন স্তালিন। সরিয়ে দিয়েছেন খাবার থালা। অস্ফুটে বলেছেন, 'আমি জানি, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার বদলে ইয়াকভ যে কোনও মৃত্যুকেই বেছে নেবে!'

'এই যুদ্ধ আর কত সন্তানকে কেড়ে নেবে!'

৪

আমরা অগণিত জনতার, লাল ফৌজিদের বীরত্বের কণামাত্র কথাতেও যাব, সে সাধ্য কী!

সেসব কথা ধরা আছে এরেনবুর্গ, কাতায়েভ, গ্রোসমান, পলেভয়, সিমোনভের গদ্যে ও কবিতায়, ১৯৪২-এ সারারাত জেগে গাওয়া শোস্তাকোভিচের সপ্তম (লেনিনগ্রাদ) সিম্ফনিতে, অগণন লোকগাঁথায়।

আমরা সেদিনের সোভিয়েত নেতৃত্ব — ভিয়াচেশ্লাভ মলোটভ, শেমেন টিমোশেঙ্কো, লাভরেন্তি বেরিয়া, গেওর্গি ঝুকভ এঁদের নিয়েও কয়েকটি মাত্র কথাও বলব, সে সাধ্য কী!

উদাহরণ হিসাবে কমরেড স্তালিন নিয়ে কয়েকটা মাত্র কথা অন্তত এক লহমায় মনে করে নেওয়া যেতে পারে।

মায়াকোভস্কি মেট্রো স্টেশনে অনেক তলায় গভীরে কমরেড স্তালিন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর যুদ্ধকালীন অফিস। সারাদিন কাজের ভার এবং সে ভার কমে আসত না রাতেও। ফলত রাতের শোওয়া বলতে খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া পাশের ডিভানেই। অথবা তাও ছেঁটে ফেলা। দুনিয়ার অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন গণমাধ্যম, রাষ্ট্র প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে নিজের ইমেজ ইমারত গড়ে তুলছেন, স্তালিন থাকছেন পূর্ণত আড়ালে। যে লেখা নিজে লেখেননি, এমন একটি লেখার মাথায় বা তলায় ব্যবহার করতে দেননি তাঁর নাম। এবং, এবং, এবং প্রায় কোনও ছবি তুলতে দেননি নিজের। দিনের পর দিন প্রাভদা এবং অন্যান্য গণমাধ্যম তাঁর পুরানো একটি বা দুটি ছবি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে কোনও নতুন ছবি না পেয়ে।

পায়ের গোড়ালিতে বুট জুতোয় বড়ো ফুটো থেকে গেছে। সেটা পরেই নাকি তিনি আরাম পেয়েছেন।

পরেছেন একটি ফার কোট। যে কোট পরে তিনি লেনিনের নির্দেশে দক্ষিণ রাশিয়া আর উত্তর ককেশাসে ১৯১৮-২০ সালে জনতার জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, লড়তে গিয়েছিলেন শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

সেই কোট পরেই তিনি ১৯৪১'র জুন মাস থেকে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ।

ব্যক্তিগত পরিচারকরা মাঝে মাঝে বুদ্ধি করে বদলে রাখত হুবহু একই দেখতে নয়া ফার কোট। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেও বোকা বানানো সহজ ছিল না স্তালিনকে। প্রতিবারই তিনি বলে উঠেছেন, 'প্রতিদিনই তোমরা সুযোগ বুঝে আমার জন্যে নতুন একটা কোট নিয়ে আস, কিন্তু আমার এই পুরানোটা আরও অন্তত দশ বছর চলবে।'

কমিউনিস্ট নেতৃত্ব।

প্রবল শ্রমের মধ্যেও তিনি সারাদিন প্রচার থেকে আড়ালে থাকেন। সাধারণ পদাতিকের মতো। গোপনে থাকেন লাখো পদাতিকের বুকের গভীরে।

ওদিকে তখন, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনের ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা স্তালিনেরই সম্মানে বাজাচ্ছে কনসার্টো।

৫

আমরা আবার ১৯৪৫'র ৯ মে-র দিকে এগিয়ে যাব।

মাঝখানে শুধু একটা কথা।

সারা রাশিয়া চেয়েছে, সারা দুনিয়া চেয়েছে পশ্চিমের মিত্রশক্তি যেন ফ্যাসিস্ত দানবদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সীমান্ত গড়ে তোলে। তাতে রাশিয়ার লোকক্ষয়, রক্তক্ষয় কিছুটা তো কমবে।

১৯৪২ থেকেই উঠেছে দাবি।

১৯৪২'র আগস্টে উইন্সটন চার্চিল এসেছিলেন মস্কোতে। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন স্তালিন। সঙ্গে একটু খোঁচা — 'ব্রিটিশ নৌবহর কী তার গৌরব ভুলে গেছে।'

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলো ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে। ততদিনে মস্কোর উপকণ্ঠ, লেনিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদ, কার্স্কের রণাঙ্গন জিতে নিয়ে লাল ফৌজ চূড়ান্ত

বিজয়ের জন্য হাঁটছে বার্লিনের দিকে।

কমরেড স্তালিনের আহ্বান, ১৯৪৫'র ১ মে, রাইখস্ট্যাগে উড়বে লাল নিশান।

ইদানীন্তনকালে পশ্চিমের গদ্য লিখিয়েরা বার্লিনে লাল ফৌজের 'যুদ্ধ তাণ্ডব' নিয়ে কোনও সুযোগই হাতছাড়া করেন না।

উল্টোদিকে কথা আছে অনেকগুলো।

বার্লিনের উপর লাল ফৌজের গোলাবর্ষণ শুরু হয় ২০ এপ্রিল ১৯৪৫। সেটা ছিল হিটলারের জন্মদিন। এবং শেষ জন্মদিন।

ঝড়ের মতো ঢুকচ্ছিল লাল ফৌজ। জেনারেল ঝুকভ বলছিলেন, আমাদের ট্যাঙ্কগুলো ট্রেনের থেকেও দ্রুত গতিতে বার্লিনের দিকে ছুটছে। অন্যদিক দিয়ে জেনারেল ইভান কোনেভ।

বার্লিনের ক্ষয়ক্ষতি দারুণভাবে এড়ানোর চেষ্টা করেছে লাল ফৌজ। এবং নাৎসিদের একটি অংশও। সাধারণ জনতা তো বটেই। তিন দল তিন ভাবে।

লাল ফৌজ বারংবার ঘোষণা করেছে বার্লিনের জার্মান সেনাদের দিকে 'ভইনা কাপুত'। দোমোই। ভইনা কাপুত। যুদ্ধ শেষ। এখন ঘরের ফেরার সময়। এই আহ্বানে বার্লিনের জার্মান সেনারা দ্রুত আত্মসমর্পণ করলে এড়ানো যেত অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংস।

নাৎসিদের একাংশ চাইছিল দ্রুত আত্মহত্যা করুক হিটলার, তাতে শান্তির প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে দ্রুত। ৩০ এপ্রিল অবধি তাদের নৃশংস হিস্টিরিয়া নিয়েই বেঁচেছিল দুই ফ্যাসিস্ত উন্মাদ হিটলার ও গোয়েবলস। ততদিনে, জার্মানরাই বলত, বার্লিন হয়ে উঠেছে রাইখেস চেইতেরহফেন — রাইখের চিতাভস্ম আগুন।

সাধারণ নাগরিকরা বার্লিনের বহু বাড়িতেই উড়িয়ে দিয়েছেন সাদা কাপড়, শান্তি প্রার্থনায়। যতদিন বেঁচেছিল গোয়েবেলস, বেছে বেছে এই বাড়িগুলোর নাগরিকদের টেনে এনে গুলি করা হয়েছে। গোয়েবলস নাকি বলছিল, এরা প্লেগ ব্যাসিলাস! গুলি করে পুড়িয়ে শেষ করে দাও।

তার আগেই অবশ্য দূরে বসে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে সেই মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাস লেখা শুরু করে দিয়েছেন আলবেয়ার কামু যার নাম—'প্লেগ'।

১ মে'র আগেই বার্লিনে ঢুকছিল লাল ফৌজ। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ইন্টার ন্যাশনাল গাইছিল ফরাসি, পোলিশ, ব্রিটিশ ইহুদি যুদ্ধবন্দি কিংবা শ্রম শিবিরের মুক্ত বন্দিরা। যথার্থ আন্তর্জাতিক।

৬

তবু আমরা ৯ মে পর্যন্ত যাব না।

আসলে, আমাদের এই দেশে আমরা এখন প্রতিদিন হেঁটে যেতে চাইছি আরও একটা বিজয় দিবসের দিকে।

সামনে দেখা যাচ্ছে বার্লিন। এক লাল ফৌজি গোলন্দাজ ইয়াকব জিনোভিয়েভিচ আরোনভ, চিঠি লিখছিল বাড়িতে, 'জীবনকে আমি খুব ভালোবাসি, আমি তো এখনও তেমন করে বাঁচিনি। আমার কেবলমাত্র উনিশ। আমি প্রায়শই মৃত্যুকে আমার সামনে দেখতে পাই, তার সঙ্গে লড়াই করি।'

আরোনভ এক সকালে মারা যায়। তার বন্ধু আরোনভের বোন ইরিনাকে লিখছে, 'সুতরাং ইরা যুদ্ধ আমাদের আলাদা করে দিল। কিন্তু এখনো আমরা একসঙ্গে লড়াই করা কমরেড। হিটলারের সাপগুলোর বিরুদ্ধে শোধ নেব।'

বনের ধারে কমরেডরা আরোনভের শরীরটা কবর দেয়। পুঁতে দেয় একটা লাঠি। লাঠির মাথায় বেঁধে দেয় এক টুকরো রাঙা কাপড়।

আমডাঙা থেকে সাগরদিঘি, লালগড় থেকে মুর্শিদাবাদ, শহিদের শরীরে রক্ত পতাকা বিছিয়ে দেওয়ার সময়, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্ত শেষ দুর্গের দিকে নির্ভীক এগিয়ে যাওয়া লাল ফৌজিরা।